১৪। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

মাইকেলকে গুরুপদে বরণ করে যাঁরা মহাকাব্য রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাইকেলের ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রায় মাইকেলের মতোই যশের অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু এ কালের সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন, "তিনি ভাষা ও ছন্দে প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না, তাঁহার কাব্যের কোন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল না, বিলাতী কাব্য পাঠে তাঁহারা অভ্যস্ত, তিনি বৈদেশিক কাব্যসাহিত্য হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছেন, তিনি মূলতঃ ভাবুকতায় তা ভাসাইয়া চলিতেন, ইত্যাদি প্রত্যেক উক্তিই কোন না কোন দিক দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।" বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর-প্রেরণাকে আত্মস্থ করবার মত শক্তি হেমচন্দ্রের ছিল না। মধুসূদনের যে প্রভাব তাঁর কাব্যের উপরে পড়েছে তাও ঐ একই কারণে বহিরঙ্গ ভেদ করে অন্তরের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১) একটি বাস্তব দুর্ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়েছিল। তাঁর বন্ধু রামকমল ভট্টাচার্য কোন কারণে আত্মহত্যা করাতে কবি গভীর বেদনা বোধ করেন, সেই পটভূমিতে 'চিন্তাতরঙ্গিণী' রচিত হয়। বীরবাহু (১৮৬৪) কাব্য কাল্পনিক ইতিহাসের পটে আঁকা স্বদেশপ্রেমের কাব্য — কিন্তু কাব্য হিসেবে এ নিতান্তই মূল্যহীন। কবির 'ছায়াময়ী' (১৮৮০) কাব্যটি দান্তের ডিভাইন কমেডিয়ার অনুসরণে রচিত। রচনাভঙ্গির দুর্বলতা সত্ত্বেও গ্রন্থটি একেবারে মৌলিকতা বর্জিত নয়। মূল কাব্য বাইবেলের অনুসরণে ভক্ত প্রীষ্টানের কথা। 'আশাকানন' (১৮৭৬) একখানি রূপককাব্য। কাব্যের ভূমিকায় গ্রন্থটির পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'আশাকানন একখানি সাঙ্কেতিক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগরি' কহে।' 'দশমহাবিদ্যা' পূর্বোক্ত কাব্যগুলির তুলনায় বিশিষ্ট, শক্তির দশ রূপকে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে দশমহাবিদ্যা বলা হয়েছে। কালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি এই দশ রূপের অন্তর্গত। কবি দেবীর দশরূপের মধ্যে মানবসভ্যতার দশটি বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব খুঁজেছেন। কালীতে বীরধর্মের আদিমত্ব দিয়ে প্রকাশিত ভুবনেশ্বরী দেখা দিয়েছেন জীবদুঃখবিনাশিনী সর্বমঙ্গলারূপে, আবার ছিন্নমস্তা সভ্যতার চরমেও আত্মঘাতী রূপ, মহালক্ষ্মীতে প্রকাশ পেয়েছে সভ্যতার সর্বোত্তম আশা-উজ্জ্বল ছবি। কাহিনীগ্রন্থির দুর্বলতায় কবির পরিকল্পনা অবশ্য কাব্যরূপে সাফল্যলাভ করেনি। তবে সতীনাম অধ্যায়ের রচিতটি কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তা স্বীকার করতে হবে। "হের সতী, হের সতী, কাঁদিল পশুপতি, পাগল শিবপ্রমথেশ"

প্রভৃতি লঘুগুরু সুরে উচ্চারিত পদ্যপংক্তির মানসিক ক্ষমতা একালে বাংলার পাঠকদের কাছে ছিল। মহাদেবের বেদনার্ত চরিত্র এবং দশমহাবিদ্যার রূপের বর্ণনা বাদ দিলে এতে আর বিশেষ কোন প্রশংসনীয় গুণ পাওয়া যাবে না, এই খণ্ডকাব্যগুলি ছাড়াও তিনি শেক্সপীয়রের Tempest অবলম্বনে 'নলিনীবসন্ত' (১৮৭০) এবং Romeo - Juliet অবলম্বনে 'রোমিও - জুলিয়েত' (১৮৯৫) রচনা করেন, এই অনুবাদে সাধারণ চরিত্র ও তাদের ভাষা-সংলাপে তিনি স্থূল বাস্তবতার অনুকরণ করেছেন, অনুবাদটির অন্যান্য স্থানে অতিশয় কৃত্রিম, কোন কোন স্থলে হাস্যকর। এই সমস্ত খণ্ডকাব্য ও শেক্সপীয়রের অনুবাদে হেমচন্দ্রের তেমন কোন প্রতিভা প্রমাণিত হয়নি, যার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালজয়ী হবেন। তিনি স্মরণীয় হয়েছেন, মাইকেলের পাশে স্থান করে নিয়েছেন 'বৃত্রসংহার (১৮৭৭) কাব্য' প্রকাশিত হবার পর। তাঁর মহাকবি আখ্যা এই মহাকাব্যের জন্যই তিনি লাভ করেছেন এবং 'মেঘনাদবধ'-র পরে বৃত্রসংহারই দ্বিতীয় মহাকাব্যের গৌরব লাভ করেছে।

বৃত্রসংহার পুরাণকাহিনী অবলম্বনে রচিত, তবে এতে কবিকল্পিত বহু বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে। সর্বোপরি হেমচন্দ্র প্রাচীন পৌরাণিক বিষয়ের উপরে উনিশ শতকের একটি ব্যাখ্যার আরোপ করতে চেয়েছেন। সে ব্যাখ্যাটি স্বদেশপ্রেমমণ্ডিত। সংক্ষেপে বৃত্রসংহারের কাহিনী এখানে বিবৃত হল। শিব বলে বলীয়ান বৃত্রের কাছে পরাজিত দেবতারা পাতালে পলায়িত। দানবেরা স্বর্গ অধিকার করেছে। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা আপন অহংকার তৃপ্ত করবার জন্য শচীকে দাসীরূপে পেতে চাইল, বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে বন্দী করে নিয়ে গেল। ঐন্দ্রিলা কর্তৃক শচী অপমানিত হলে ক্রোধে মহাদেব বিচলিত হলেন, বৃত্রের উপরে আপন আশীর্বাদ প্রত্যাহার করে নিলেন। ব্রহ্মকে সন্তুষ্ট করে ইন্দ্র বৃত্রের বধোপায় জানতে পারল। দধীচির অস্থি নিয়ে এসে বজ্র নির্মিত হল। অবশেষে দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক যুদ্ধের পরে বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর প্রাণত্যাগ করল।

ঘটনা এবং বিন্যাসে বৃত্রসংহারে মহাকাব্যের ও লক্ষণ আছে। জগদ্বাসীর কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগ, স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেব - দানবের সংগ্রাম, স্বর্গ - মর্ত্য - পাতাল, সূর্যলোক - চন্দ্রলোক, কুমেরু - সুমেরু প্রভৃতির বর্ণনা, ঘটনার প্রাচুর্য, বীর ও রৌদ্র রসের ছড়াছড়ি — মহাকাব্যের উপযোগী বিপুলতা ও গাম্ভীর্যের সমস্ত উপকরণই এখানে সংগৃহীত হয়েছিল। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধ কাব্য থেকে যেমন অনেক কিছুই হেমচন্দ্র সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন তেমনি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি অটল আনুগত্যও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মধ্যে সেই শক্তি ছিল না যাতে এই সব উপকরণ আত্মসাৎ করে মহাকাব্যের স্বাদ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রাণহীন বিবৃতি, অকারণ চীৎকার এবং অসঙ্গতির কারণে কাব্যটি পরিপূর্ণ। হেমচন্দ্রের মধ্যে কাহিনির

প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না, বৃত্রসংহারে তাই কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুসরণ চলেছে। স্বাদেশিকতার প্রচারের দিক থেকেও লেখকের দৃষ্টি সর্বত্র প্রকট। মধুসূদনের অনুসরণে তিনি দানবের প্রতি সমর্থন জানাতে চেয়েছেন, কিন্তু হিন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতাবশে দেবতাদের প্রতিই তাঁর সমর্থন। বাস্তুহারা দেবতার জয়; অক্লান্ত দেশরক্ষায় তৎপর দানবেরা তাঁর জাতীয়তাবাদী সহানুভূতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে।

চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে হেমচন্দ্র মূলত ব্যর্থ হয়েছেন, তবে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ সাফল্যের পরিচয় আছে। বৃত্রের এই চিত্রটি বীরোচিত—

ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।

কিন্তু তার চেয়েও উপাদেয় বৃত্রের অতিমানবিক ভয়ংকর মূর্তিতে আকাশের বুক থেকে গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র ছিঁড়ে এনে দেবসৈন্যকে প্রহার করার বর্ণনা —

ঘোর নাদে ছিঁড়ি নীহারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি,
ছুঁড়িতে লাগিল কোটি নক্ষত্র আঘাতি---
- - - - - - - - - - - - - - -
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।

কিন্তু বৃত্র অতিমানবিক দানবীয় শক্তির অধিকারী হয়েই থেকেছে। তাঁর স্বভাবগত চরিত্র, তার পত্নীপ্রেম দেহধর্মে সীমাবদ্ধ। তার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সে মৃত্যুতে ট্র্যাজেডির হাহাকার নেই। কারণ তার চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের গৌরব নেই। ঐন্দ্রিলা চরিত্রে দর্প ও তেজ কিছু প্রকাশ পেলেও ঈর্ষা, লালসা, প্রগলভতার জন্য যে আত্মপ্রদর্শ, রুদ্রপীড় বীরত্ব দেখাবার জন্য মেঘনাদের নায়কের মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছে। তার পত্নী ইন্দুবালা বাঙালি পরিবারের অশ্রুমুখী নারীতে পরিণত হয়েছে। দেবচরিত্রগুলি কোনোটিই প্রাণবন্ত নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঐ কাব্যের নামকরণে কল্পিত, অবশ্য কাব্যে অন্তরীক্ষলোক, বিশ্বকর্মশালা প্রভৃতির বর্ণনায় মহাকাব্যিক ভাস্কর্য কিছু প্রকাশ পেয়েছে।

কবি কাব্যটির কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বীর ও রৌদ্ররসাত্মক স্থান ছাড়া অন্যত্র মিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্যের আশ্রয় নিতে চেয়েছেন, তাঁর মিত্রাক্ষরের ছন্দ তরল ও সঙ্গীতধর্মী। তাঁর অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ার মাত্র — যতিপাতের স্বাধীনতা যেখানে নেই ধ্বনিময়তা নেই, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও অল্প। আসলে মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষরের তাৎপর্যটি হেমচন্দ্র অনুধাবনই করতে পারেননি,

অবশ্য মহাকাব্য ছেড়ে দিলে, কবি হেমচন্দ্র কতকগুলি বিষয়ে

নিশ্চয়ই গৌরব দাবি করতে পারেন। যেমন, ইংরেজী লিরিক কবিতার অনুবাদ, উক্ত আদর্শে মৌলিক গীতিকবিতা লিখবার চেষ্টা এবং রঙ্গব্যঙ্গাত্মক সামাজিক কবিতার বিস্ময়কর দীক্ষাভার। তাঁর তিনখানি গীতিকবিতা-সংগ্রহে (কবিতাবলী, প্রথমখণ্ড — ১৮৭০; ঐ দ্বিতীয়খণ্ড — ১৮৮০ এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮)) কিছু প্রতিভার ছাপ আছে। এছাড়াও ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শেক্সপীয়র, পোপ, ড্রাইডেন, লংফেলো, শেলী, কীটস প্রভৃতি অনেক কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেছিলেন, সে অনুবাদের দু একটি মাত্র সুখপাঠ্য হয়েছে, অন্যগুলি আক্ষরিক অনুবাদের কৃত্রিমতায় ভরা। তবে পাশ্চাত্য গীতির গীতিকবিতার প্রধান সুর যে মন্ময়তা (subjectivity) তা তিনি প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বহু গীতিকবিতায় ব্যক্তি-হৃদয়ের বেদনামাধুরী উপলব্ধি করা যায়। প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেম নিয়ে তার যে গীতিকবিতা সেগুলোও যথেষ্ট কাব্যগ্রাহী ও আবেগপ্রবণ। আবার ঈশ্বর গুপ্তের রচনাধারা অনুসরণ করে আবেগব্যাকুল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গকাব্যের তীক্ষ্ণতা এনে তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। অবশ্য বিশুদ্ধ লিরিক ঔৎকর্ষ্য, রোমান্টিক কল্পনা প্রভৃতি তাঁর ততটা ছিল না, ফলে সাদামাটাভাবে মনের ভাব প্রকাশে তিনি সক্ষম হলেও সূক্ষ্মতর কাব্যবৃত্তি, দূরপ্রসারী চিত্রকল্পনা, ভাষা ও ব্যঞ্জনার প্রতীকতা ইত্যাদি অভাবে তাঁর গীতিকবিতাগুলি খুব উচুদরের নয়। তবে সাধারণভাবে ইংরাজী গীতিকবিতার অনুসরণের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য।

শেষ জীবনে কবি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই বেদনাময় অন্ধকারে তিনি আর্তনাদ করে জীবনেশ্বরকে প্রশ্ন করেছেন —

আমার রজনী শেষ হবে নাকি হে ভবেশ
জানিব না দিবা কারে বলে।

কবির রজনী প্রভাত হয় নি, অন্ধকবি অন্ধকারের মধ্যেই আলোক সুন্দর বসুন্ধরা থেকে বিদায় নিয়েছেন।